KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৬নং হেস্টিংস স্ট্রিট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ আশ্বিন ১৩২৬ শ্রাবণ ১৩২৬ পৌষ ১৩২৬
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

কথিকা।

—:*:—

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে,—মাটির কাছে ধরা দেবে বলে'। তেমনি কোথা থেকে মেয়েরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে।

তাদের জন্য অল্প জায়গার জগৎ, অল্প মানুষের। ঐটুকুর মধ্যে আপনার সবটাকে ধরানো চাই—আপনার সব কথা, সব ব্যথা, সব ভাবনা। তাই তাদের মাথায় কাপড়, হাতে কাঁকন, আঙিনায় বেড়া। মেয়েরা হল সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী।

* * * *

কিন্তু কোন্ দেবতার কৌতুকহাস্যের মত অপরিমিত চঞ্চলতা নিয়ে আমাদের পাড়ায় ঐ ছোট মেয়েটির জন্ম? মা তা'কে রেগে বলে "দস্যি," বাপ তাকে হেসে বলে "পাগ্‌লী"।

সে পলাতকা ঝরনার জল, শাসনের পাথর ডিঙ্গিয়ে চলে। তার মনটি যেন বেণুবনের উপরডালের পাতা, কেবলি ঝির্ ঝির্ করে কাঁপচে।

আজ দেখি সেই দুরন্ত মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে—বাদলশেষের ইন্দ্রধনুটি বল্লেই হয়। তার বড় বড় দুটি কালো চোখ আজ অচঞ্চল, তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে ডানা-ভেজা পাখীর মত।

কিছুদিন আগে রৌদ্রের শাসন ছিল প্রখর; দিগন্তের মুখ বিবর্ণ; গাছের হতাশ্বাস পাতাগুলো শুকিয়ে হল্‌দে হয়ে গেছে।

এমন সময় হঠাৎ কাল আলুথালু পাগ্‌লা মেঘ আকাশের কোণে কোণে তাঁবু ফেল্‌লে। সূর্য্যাস্তের একটা রক্ত-রশ্মি খাপের ভিতর থেকে তলোয়ারের মত বেরিয়ে এল।

অর্দ্ধেক রাত্রে দেখি দরজাগুলো খড়্‌খড়্‌ শব্দে কাঁপ্‌চে। সমস্ত সহরের ঘুমটাকে ঝড়ের হাওয়া মুঠি ধরে ঝাঁকিয়ে দিলে।

উঠে দেখি, গলির আলোটা ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা চোখের মত দেখতে। আর গির্জ্জের ঘড়ির শব্দ এল যেন বৃষ্টির শব্দের চাদর মুড়ি দিয়ে।

সকালে জলের ধারা আরো ঘনিয়ে এল—রৌদ্র আর উঠ্‌ল না।

* * * *

এই বাদলায় আমাদের পাড়ার মেয়েটি বারান্দার রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

তার বোন এসে তাকে বল্লে, 'মা ডাক্‌চে'। সে কেবল সবেগে মাথা নাড়ল, তার বেণী দুলে উঠ্‌ল। কাগজের নৌকো নিয়ে তার ভাই তার হাত ধরে টান্‌লে। সে হাত ছিনিয়ে নিলে। তবু তার ভাই খেলার জন্যে টানাটানি করতে লাগ্‌ল। তাকে এক থাপড় বসিয়ে দিলে।

* * * *

বৃষ্টি পড়চে। অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এল। মেয়েটি স্থির দাঁড়িয়ে।

আদি যুগে সৃষ্টির মুখে প্রথম কথা জেগেছিল জলের ভাষায়, হাওয়ার কণ্ঠে। লক্ষ কোটি বছর পার হয়ে সেই স্মরণ বিস্মরণের অতীত কথা আজ বাদ্‌লার কলস্বরে ঐ মেয়েটিকে এসে ডাক দিলে। ও তাই সকল বেড়ার বাইরে চলে গিয়ে হারিয়ে গেল।

কত বড় কাল, কত বড় জগৎ, পৃথিবীতে কত যুগের কত জীবলীলা। সেই সুদূর সেই বিরাট, আজ এই দুরন্ত মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল, মেঘের ছায়ায় বৃষ্টির কলশব্দে।

ও তাই বড় বড় চোখ মেলে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল,—যেন অনন্তকালেরই প্রতিমা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞাপন রহস্য।

—:*:—

শ্রীযুক্ত সবুজপত্র সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

এই আজ দু'তিন দিন হল একখানি স্বদেশী ইংরাজি-মাসিকপত্রে পড়লুম যে, আপনি পথ-চলতি ভাষাকে সাহিত্যে চালাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। শুনে খুসি হবেন যে, উক্ত পত্রের লেখক-সম্পাদক উভয়েরি মতে আপনার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। চলতি ভাষার চল নাকি এখন সকল কাগজেই হয়েছে—শুধু তাই নয়, যে সকল কাগজ মুখে চলতি ভাষার অতি বিরোধী, তারাও নাকি এমন সব লেখা প্রকাশ করে, যা আসলে গলিঘুঁজিতে চলতি হলেও রাজপথে অচল। এ কথা সম্ভবত সত্য, কেননা ইংরাজিতে বলে extremes meet,—অর্থাৎ দু-মুড়োতে ঠেকাঠেকি হয়।

কিন্তু এর থেকে মনে করবেন না যে, সাধুভাষার পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। ভাল কথা, ভাষা সম্বন্ধে সাধু বিশেষণটা কি শুদ্ধ? আমার মতে ওটি সাধু না হয়ে সাধ্বী হওয়া উচিত। তাতে কেতাবী-ভাষার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলের—অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইংরাজি উভয় ভাষারই মর্য্যাদা সমান রক্ষিত হয়। সেদিন জনৈক

বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনলুম যে, আপনার ভাষার রূপলাবণ্য, বেশভূষা, হাস্যলাস্য সবই থাকতে পারে, কিন্তু তার প্রধান দোষ এই যে, তা chaste নয়।

সে যাই হোক্, আমি ঐ সাধু বিশেষণটিকে একেবারে বাদ দিতে চাই নে, কেননা আমি সাহিত্য থেকে কোনও চলতি কথাকে বহিষ্কৃত করবার পক্ষপাতী নই। তবে সেই সঙ্গে "সাধ্বী" বিশেষণটিও স্থলবিশেষে ব্যবহার করব।

বাজে বকুনি ছেড়ে, এখন কাজের কথায় ফিরে আসা যাক্। সাধুভাষা এখন মাসিক পত্রের বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তার পৃষ্ঠে ভর করেছে। এক কথায়, সাধুভাষা এখন সাহিত্যকে ত্যাগ করে বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিয়েছে। এই বিজ্ঞাপনের ভাষারই উচিত নাম হচ্ছে সাধ্বী। "আশ্রয় নিয়েছে" বলাটা বোধ হয় ঠিক হল না, কেননা বিজ্ঞাপনের দেশে এই সাধ্বীভাষা এখন রাণীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপ্রতিহত প্রভাবে দেশের লোকের মনোরঞ্জন করছে। সাধুভাষাকে লোকে কেন সাহিত্যের ভাষা বলে?—এই কারণে যে, লোকের বিশ্বাস সাহিত্যের যা আসল উদ্দেশ্য—অর্থাৎ পাঠককে কাঁদানো হাসানো ইত্যাদি—তা একমাত্র উক্ত ভাষার দ্বারাই সাধ্য হয়। আপনি যদি একসঙ্গে কাঁদতে ও হাসতে চান, তাহলে এই পূজোর বিজ্ঞাপনগুলি পাঠ করুন, তাহলেই সাধ্বীভাষার শ্রী স্ত্রী ধী সম্বন্ধে আপনার সম্যক জ্ঞানলাভ হবে। আর এ ভাষার জ্যোতি! সূর্য্যের পাশে দীপ যেমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, বিদ্যুতের পাশে খদ্যোত যেমন মিট্‌মিট্ করে, এই বিজ্ঞাপনের সাধ্বীভাষার পাশে সাহিত্যের সাধুভাষার অবস্থাও তদ্রূপ হয়। এমন কি ঢাকা

জেলার সুবিখ্যাত সাহিত্যিক, সাধুভাষার অদ্বিতীয় লেখক ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাত চিন্তা' ও নিস্প্রভ হয়ে পড়ে, 'সন্ধ্যা চিন্তা' মিট্‌মিট্‌ করে।

যদি বলেন যে আপনি ওসব পড়তে চান না, তার উত্তর এই,—

"উপেক্ষার উপায় নাই, অবজ্ঞার সুযোগ নাই। জানিতেই হইবে, পড়িতেই হইবে, বুঝিতেই হইবে, অশ্রুবর্ষণ অনিবার্য্য! কে আছ ব্যথিতের বন্ধু, আর্ত্তের অবলম্বন, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়,—এসো, তোলো, জাগো, এ ক্রন্দন, এ নিবেদন, এ হা-হুতাশ শুনিতেই হইবে"—

উপরোক্ত বাক্যাবলী "পতিতা" নামক সামাজিক উপন্যাসের বিজ্ঞাপন হতে উদ্ধৃত। এ উদ্ধারের কারণ—"পতিতা" সম্বন্ধে যা সত্য, বিজ্ঞাপনের সাধ্বীভাষা সম্বন্ধেও ঠিক তাই সত্য। আমি এ স্থলে উক্ত ভাষার কোনও বিশেষ নমুনা তুলে দিতে পারছি নে, কেননা আগা-গোড়া বিজ্ঞাপন ঐ একই ভাষায় লিখিত,—পড়া শেষ করবার আগে বিজ্ঞাপিত বস্তু ওষুধ কি জুতো, শাড়ী কি সাহিত্য, কিছুতেই ধরা যায় না। আমি দুটি একটি উদাহরণ দিচ্ছি :—

"রৌপ্যমণ্ডিত রেশ্‌মী কিংখাপে মোড়া হইয়া অতুলন স্বর্ণ সংস্করণ।"

এই বস্তুটি কি জানেন?—শাড়ী নয়, উপন্যাস। তারপর বলুন ত বক্ষ্যমান পদার্থটি কি?

"অতি মোলায়েম রঙিন রেশমের ক্রেপ পোতের ডুরেদার চাকচিক্যমান।"

এ জিনিষটি কিন্তু অপূর্ব্ব উপন্যাস নয়, "আহামরি শাড়ী"; তাহলেও জিনিষটি পাওয়া যাবে কিন্তু বীণাপাণি দেবীর কাছে। সাহিত্যের

গৌরব অবশ্য নির্ভর করে তার অলঙ্কারের উপর, আর অলঙ্কারের সেরা হচ্ছে উপমা আর অনুপ্রাস। এ দুই বিষয়েও বিজ্ঞাপনের কৃতিত্ব অপূর্ব্ব। প্রথমে অনুপ্রাসের একটি নমুনা দিই :—

"মৃত্যুযবনিকা, পরিণয় প্রহেলিকা, ভ্রান্তি কুহেলিকা, হত্যা বিভীষিকা, লুব্ধমরীচিকা, রহস্য কণিকা।"—উক্ত সাহিত্যের রচয়িতা কে জানেন?—মল্লিদার! মল্লিদার কে জানেন?—"বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক নক্সা"-লেখক। আপনি মল্লিদারের "আপন পর"খানি কিনে এনে নয়ন মন সার্থক করুন, কেননা বইখানি "উপহারের রাজা" কিন্তু "না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই"। দামও সস্তা—মূল্য এক টাকা মাত্র। এ ক্ষেত্রে "আপন পর" কি সূত্রে আবদ্ধ জানেন?—"বিলাত হইতে কেবলমাত্র আমাদের জন্য আনীত অপূর্ব্ব রেশমী ফিতায়"। উক্ত নমুনার অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি এই বিজ্ঞাপনসাহিত্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখতে পাবেন। এখন উপমার গুটি দুই তিন উদাহরণ দিই :—

(১) মল্লিদারের "বিভ্রাট," পাকা হাতের পাকা লেখা—ঠিক যেন রসের ফোয়ারা।

(২) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়ের "পতিতা", নারীর ত্যাগের নায়েগ্রা প্রপাত"।

(৩) "বঙ্গীয় উপন্যাসলেখকশিরোমণি প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত, রেশমী কিংখাপে মোড়া "পাষাণী", বিরহের বিসুবিয়াস অথচ প্রেম প্রতিদানের এমন গোলকুণ্ডার মতির মালা,"—অথচ দাম একটাকা। আলঙ্কারিকেরা বলেন যে উপমা হচ্ছে অলঙ্কারের শিরোমণি, যেমন গহনার ভিতর মালা আর কুটুম্বের

মধ্যে শালা। এ মত যে সত্য, উক্ত উপমাগুলির সাক্ষাৎ লাভ করে সে কথা কি আর কেউ সন্দেহ করতে পারেন? উপরোক্ত কবি-প্রতিভার চরম সৃষ্টিগুলি সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু সাবধান!—শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "পোকা মাকড়" যেন সেই সঙ্গে কিনবেন না, তাহলে দুদিনেই ও সব রেশমী বই কেটে রেশমী মিঠাই বানিয়ে দেবে।

(২)

আমি বিশেষ করে এই বিজ্ঞাপনসাহিত্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই জন্যে যে, আপনি গত পাঁচ বৎসর এ সাহিত্যকে সবুজপত্রে স্থান দেন নি। আপনি বলতেন যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা, আর বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য মিথ্যা প্রচার করা। অতএব উভয়ের স্থান এক পত্রে হতে পারে না। আপনার কথা ছিল এই যে, বিজ্ঞাপনমাত্রেই মিথ্যাবাদী,—যেখানে তা স্পষ্ট মিথ্যে কথা বল্‌তে সঙ্কুচিত হয়, সেখানে তা suggestio falsii-র আশ্রয় গ্রহণ করে। ঔষধ সম্বন্ধে যাই হোক, সাহিত্য সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে আপনি যে উক্তিকে suggestio falsii-র দোষে দোষী কর্‌তেন, সেটি যে একটি আলঙ্কারিক গুণ, অর্থাৎ তা যে অতিশয়োক্তি, এ জ্ঞান আপনার ছিল না। "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি", সে রচনা যে গৌড়ী রীতিতেই রচিত হওয়া কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সে রীতির একটি উদাহরণ দিচ্ছি :—

"অল্পং নির্ম্মিতমাকাশম্ নালোচ্যৈব বেধসা
ইদং এবংবিধং ভাবি ভবত্যা স্তনজৃম্ভনম্" ॥ (কাব্যাদর্শ)

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন এবম্বিধ মহাকবিত্ব করে গেছেন, তখন আমরাই বা কেন না বিরহের Vesuvius এবং ত্যাগের Niagara Falls-এর সৃষ্টি কর্‌ব? শাস্ত্রেই আছে :—

"বাপ্ কো বেটা সিপাহি কো ঘোড়া
কুছ্ নহি ত থোড়া থোড়া।"

এতদিনে আপনার ভুল আপনি যে বুঝতে পেরেছেন, সে কথা মুখে স্বীকার না কর্‌লেও কার্য্যত আপনি তার প্রমাণ দিচ্ছেন। 'সবুজপত্র' এখন বুকে পিঠে বিজ্ঞাপন নিয়ে বেরচ্ছে। তবে বইয়ের বিজ্ঞাপনের পাঁচরঙা ছাপ আপনার কাগজ আজও অঙ্গে ধারণ করে নি,—অবশ্য আপনার স্বরচিত পুস্তকের ছাড়া। এই সম্বন্ধেই আমি আপনার কাছে একটি কথা নিবেদন কর্‌তে চাই। ঘুরিয়ে মিথ্যে কথা দু'রকম করে বলা যায়,—এক suggestio falsii-র সাহায্যে, আর এক suppressio verii-র সাহায্যে। 'সবুজপত্র' জন্মাবধি বাঙলা সাহিত্যের বিজ্ঞাপনকে প্রত্যাখ্যান করে, সত্যগোপনের দোষে দোষী হয়ে রয়েছে। এ যে কত বড় দোষ তার প্রমাণ, আমার মত মাত্র-সবুজপত্রের পাঠকেরা বাঙলা সাহিত্যে যে কত অমূল্য রত্ন আছে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অপরাপর মাসিক পত্রের কৃপায় জানতে পেলুম যে, বাঙলা ভাষায় এমন অসংখ্য কাব্য আছে, যার প্রতিখানি একসঙ্গে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অতুলনীয়। আমি এর মধ্যে খানকতকের পরিচয় দিচ্ছি :—

(১) নিরুপমা পুরস্কার—"সরস ভাবোজ্জ্বল ভাষাসম্পদে অতুলনীয়, বাজারের কেনা গল্পপুস্তকে একত্র এমন সৌন্দর্য্যসমাবেশ কোথায়ও পাইবেন না।"—

(২) মঞ্জুরী—"সুরেন বাবুর ছোট গল্প না পড়িলে ছোট গল্প পড়া অসম্পূর্ণ থাকে। প্রত্যেকটি গল্প যেন রাফেলের জীবন্ত চিত্র"।—

(৩) পল্লী-সংসার—"বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ভাবে ভাষায় চরিত্র-চিত্রণে ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে সর্ব্বাংশে অতুলনীয়।"

(৪) বন্দিনী—"ভাষায় ভাবে চরিত্রচিত্রে অতুলনীয়।"

(৫) দগ্ধকচু—"এমন অপূর্ব্ব উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে আর কখন হয় নাই।"—

(৬) গৃহলক্ষ্মী—"বাঙলা উপন্যাসে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।"

(৭) অভিসার—"এমন বিয়োগান্ত উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বহুকাল বাহির হয় নাই।"

আর কত নাম করব?—"মাতৃদেবী", "সহধর্ম্মিণী", "নববধূ" প্রভৃতি সবই অপূর্ব্ব, সবই অতুলনীয়, সবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিশ্বাস না করেন, এর মধ্যে অন্তত দুটি জাঁকড়ে কিনতে পারেন, যাচিয়ে নেবার জন্যে। বিজ্ঞাপনদাতা কথা দিয়েছেন যে "নববধূ মনোনীত না হইলে ফিরাইয়া আনিবেন, মূল্য ফেরত দিব"। "বন্দিনী" সম্বন্ধেও ঐ একই করার—"কিনুন, ভাল না হয় মূল্য ফেরত দিব"। এর চাইতে সাধু প্রস্তাব আর কি হতে পারে? অপরখানি সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনদাতা আদেশ করেছেন—"সহধর্ম্মিণী ক্রয় করিতে ভুলিবেন না",—তবে ক্রেতার তা অপছন্দ হলে ফেরত নেবার কথাটা উহ্য রয়ে গিয়েছে।

বাঙলা ভাষার ঐশ্বর্য্য কিরকম বেড়ে গেছে, তার পরিচয় পেয়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আপনি ত নানা সাহিত্যের পল্লবগ্রাহী। কি ইংলণ্ড, কি ফ্রান্স, কি ইতালি, ইউরোপের কোন দেশ দেখাক্‌ত এত অসংখ্য উপন্যাস, যা যুগপৎ 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' এবং 'অতুলনীয়'। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চাইলে তারা এক এক যুগের বড় জোর এক একখানি গ্রন্থ বার করতে পার্‌বে।

এই বিজ্ঞাপন পাঠে প্রথমেই মনে এই প্রশ্ন উদয় হয়—

"একি স্বপ্ন! একি মায়া! একি বাস্তব! একি বাস্তবের ছায়া?" কেননা, এই সব অপূর্ব্ব উপন্যাসের লেখকেরা কে?—এ প্রশ্নের উত্তর "উপন্যাস সিরিজ" দিয়েছেন। সিরিজের বক্তব্য এই:—

"বাণীমন্দিরের একনিষ্ঠ পুজারীগণের বঙ্গবিশ্রুত সেই সকল সাহিত্যরথীবৃন্দের নামের একত্রীভূত তালিকা দৃষ্টে যুগপৎ বিস্ময়ে সকলকেই বলিতে হইবে—ইহারা করিয়াছে কি? ধন্য!"

"ইহারা করিয়াছে কি"? এ প্রশ্ন আমার মনেও উদয় হয়েছিল—এবং উত্তর পেয়ে আমিও বলছি—ধন্য। উত্তরটি তবে শ্রবণ করুন—

"বিশ্রামের অবসর নাই—কেবল কার্য্য,—সারাটি বৎসর ধরিয়া নিত্য-নব পূজার উদ্বোধন"।—এর পর আপনি আমি সকলেই বল্‌তে বাধ্য—ধন্য বঙ্গদেশ, ধন্য বঙ্গ-সরস্বতী।

অতঃপর আর একটি প্রশ্ন এই মনে আসে যে, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায়?—বিজ্ঞাপনের কথা বিশ্বাস কর্‌তে হলে—অতি নীচে, প্রায় লাস্ট কেলাসে। তাঁর "ঘরে বাইরে" সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনের মন্তব্য এই—"প্রকৃতপক্ষে ইহা বাঙ্গালীর রহস্যমুকুর, এরূপ উপন্যাস আর কখনও বাহির হয় নাই"।—মল্লিদারের "আপন-পরের" বিজ্ঞাপিত

গুণাগুণের সঙ্গে তুলনা করলেই আপনার বুঝতে বাকী থাক্‌বে না যে "ঘরে বাইরের" স্থান কোথায়। এখন দেখছি ও উপন্যাসের বাইরে না বেরিয়ে ঘরে থাকাই উচিত ছিল। সে যাই হোক্, এ বিষয়ে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নেই যে "বঙ্গ-বিশ্রুত সাহিত্যরথীবৃন্দের" পাশে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে বেজায় অপ্রতিভ দেখাচ্ছে। এ স্থলে আমি একটা কথা না বলে থাক্‌তে পারছি নে। সবাই জানে যে, চেনা বামুনের পৈতের দরকার নেই, অপরপক্ষে রাঁধুনে বামুনদের যে ও সার্টিফিকেটের দরকার আছে শুধু তাই নয়, সে সার্টিফিকেট তারা দেখাতে বাধ্য—নইলে কেউ তাদের পাক-স্পর্শ করবে না। এখন বিজ্ঞাপন দাতা-মহাশয়দের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের এই বৃদ্ধবয়সে নূতন করে পৈতা দেবার কি আর কোনও দরকার ছিল?

এ ক্ষেত্রে, আমার নিজের একটা জবাবদিহি আছে। আজ থেকে ঠিক সাত বৎসর আগে, পূজোর বিজ্ঞাপন পাঠে উত্তেজিত হয়ে আমি "মলাট সমালোচনা" নামক একটি প্রবন্ধ হাতঝেড়ে লিখি। সে প্রবন্ধ পড়ে পুস্তক-ক্রেতার দল শুনতে পাই খুসি হয়েছিলেন, কিন্তু বিক্রেতার দল বিরক্ত হয়েছিলেন।

আজ আমি বাঙলার লেখক পাঠক উভয় দলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে, সেকালে আমি বিজ্ঞাপনসাহিত্যের মাহাত্ম্য মোটেই বুঝতে পারি নি; কিন্তু এ বিষয়ে আজ আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে।

দার্শনিকেরা বলেন যে বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, অতএব সাহিত্যের যুগ নয়। আমি এর প্রথম কথাটি সম্পূর্ণ মানি—কিন্তু শেষ কথাটি ষোলআনা মানি নে। যদি কেউ বলেন যে বিজ্ঞানের

যুগে সেকেলে সাহিত্য চল্‌বে না, চলবে শুধু বিজ্ঞানজড়িত ..., তাহলে আর কোনও আপত্তি থাকে না।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বিশেষ করে জানা, কিন্তু কোনকিছু বিশেষ করে জেনে কোনই ফল নেই, যদি না সেই সঙ্গে তা' অপরকে বিশেষ করে জানানো যায়। এই উদ্দেশ্য সাধন করে বিজ্ঞাপন, কেননা ও শব্দের অর্থই হচ্ছে, বিশেষ করে জানানো। আমার এ যুক্তি যদি অকাট্য হয়, তাহলে সকলকে মানতেই হবে যে, এ যুগের উপযুক্ত সাহিত্য হচ্ছে বিজ্ঞাপনসাহিত্য। যাঁরা অন্যপ্রকার সাহিত্য রচনা করেন, তাঁরা যুগধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন, অতএব তাঁদের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

তারপর সাহিত্যের দিক থেকে বিচার করতে গেলেও দেখা যাবে যে, এই বিজ্ঞাপনসাহিত্যের স্থান কত উপরে। আজ শ'-খানেক বছর ধরে ইউরোপের সাহিত্যজগতে Classic আর Romantic দলের ভিতর একটা মহা লড়াই চলেছে। Classic দল বলেন সাহিত্যের উপকরণ হচ্ছে বাইরের সত্য, আর তার কারণ হচ্ছে চোখে-দেখা ভাষা; আর Romantic দল বলেন সাহিত্যের উপকরণ হচ্ছে ভিতরকার সত্য, আর তার কারণ হচ্ছে কানে-শোনা ভাষা। সংক্ষেপে Classic দল গ্রাহ্য করেন শুধু মাথার ভাব আর বইয়ের ভাষা; আর Romantic-দের কাছে গ্রাহ্য শুধু বুকের ব্যথা আর মুখের কথা। ইউরোপে এ দুয়ের আজও মিল হয় নি। কিন্তু বাঙলার বিজ্ঞাপনসাহিত্য এই দু-পক্ষের মিলনরূপ অসাধ্য সাধন করেছে। এ সাহিত্যের ভাষা যেমন খাঁটি সংস্কৃত—অর্থাৎ Classic, এর ভাবও তেমনি খাঁটি বাঙালী—অর্থাৎ Romantic। ব্রাহ্মণের ভাষায় এমন "রসের ফোয়ারা"

বাঙালী লেখক ছাড়া আর কে তুলতে পারে? খাঁটি বাঙালী মনোভাবটি কি জানেন?—সহৃদয়তা। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে আমাদের হৃদয়ে যে কতটা রসভার হয়েছে, তা কে না জানে? এই ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মাতৃভূমির প্রতি মাতৃভক্তি যে কি পর্য্যন্ত বেড়ে গিয়েছে, তার জোর প্রমাণ ত আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রের সাবেগ ও সকাতর অম্বারব। সেই সঙ্গে দেবীর প্রতিও আমাদের মাতৃভক্তি যে সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে মাটিতে দেশ তৈরি, সেই মাটিতেই ত আমাদের দেবীও তৈরি। আমাদের দেবীভক্তি যে কতটা বেড়ে গেছে, তার প্রমাণ—সেকালে আমরা বিজয়ার দিন শুধু ভাঙ খেতেম, আর একালে আমরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দেশসুদ্ধ লোক যে ঘটস্থাপনার দিন থেকে শুধু ভাঙ নয়, গাঁজাও খেতে সুরু করি—তার পরিচয় এই পূজোর বিজ্ঞাপন। ইতি—১লা আশ্বিন।

বীববল।

পুঃ—এ পত্র আপনাকে ভয়ে ভয়ে পাঠাচ্ছি। আশা করি আমার উপর এ সন্দেহ করবেন না যে, আমি পুস্তকবিক্রেতাদের কাছে ঘুষ খেয়ে এই প্রবন্ধের ছলে বিনা পয়সায় তাঁদের বইয়ের বিজ্ঞাপন সবুজপত্রে প্রকাশ করবার ফন্দি করেছি। আমার উদ্দেশ্য আপনার মারফৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের এই সুসংবাদটি জানানো, যে text-book লেখবার উপযুক্ত ভাষা বিজ্ঞাপনদাতারা ইতিমধ্যে নির্ম্মাণ করে বসে আছেন কেননা—এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি যে, এর চাইতে একাধারে chaste এবং elegant ভাষা বঙ্গসাহিত্যে আর কোথায়ও খুঁজে পাবেন না।

ভারতের নারী।

—:*:—

কয়েক দিন হলো বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী 'ভারতের নারী' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে সে-সভায় লর্ড সিংহ বলেছিলেন—যতদিন রমণীদের প্রতি ভারতের পুরুষদের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন না হবে, ততদিন তার উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। যদিচ মন্তব্যটি আমাদের আত্মসম্মানের গায়ে আঘাত করে—তথাপি সেটি যে সত্য, সারবান এবং আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণজনক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লর্ড সিংহ যে সাহস করে আমাদের জাতির একটা মহা কলঙ্কের দিকে সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তজ্জন্য মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদও দিয়েছিলাম। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, যিনি যে-ভাবে যে-ক্ষেত্রে যতই কেন চেষ্টা না করুন এবং আগ্‌ড়ম বাগ্‌ড়ম যাই কেন না বকুন—জাতিভেদ ও স্ত্রীজাতির পরাধীনতা—এ দুটি মহাব্যাধি যতদিন না আমাদের সমাজদেহ থেকে বিতাড়িত হবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে জাতির বা জাতীয় উন্নতির কথা মুখে আনা বাচালতা মাত্র।

(২)

এখন দেখছি—মূর্খ আমরা, সব ভুল বুঝেছি। স্বদেশী-মন্ত্র প্রচারের আদি-গুরু শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সেদিন বিলাত যাওয়ার পূর্ব্বে তারস্বরে বক্তৃতা করে বলে গেছেন যে, লর্ড সিংহের উক্তির দ্বারা ভারতের নরনারীর প্রতি অযথা অবমাননা প্রকাশ করা হয়েছে, এবং যার কিছুমাত্র আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান আছে, তার পক্ষে এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানান উচিত। তিনি আরও বলেছেন, ইংরাজদের রমণীসম্বন্ধে যা-কিছু ধারণা, তা sex-ভাব দ্বারা সীমাবদ্ধ; আর আমাদের সকল ধারণা মাতৃত্বের মহান্ ও পবিত্র কেন্দ্র হতে বিকশিত। তাঁর মতে ১৮৮২ সনে Married Woman's Act প্রবর্ত্তিত হবার পূর্ব্বে ইংরাজ-নারী নাকি chattel-এর সামিল ছিল; এবং লর্ড সিংহের এসব বিষয়ে, অর্থাৎ বিলাতের আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য তিনি তাঁর প্রতি দয়া প্রকাশ না করেও থাকতে পারেন নি। দয়ারই পাত্র বটে, কারণ দুর্ভাগ্য তাঁর—ঈদৃশ দেশ-হিতৈষীগণের তিনি স্বদেশবাসী!

(৩)

পোড়ো বাড়ীতে একটি শৃগাল ডেকে উঠলে, রাজ্যের যত শেয়ালের হুকাহুয়াস্বরে কণ্ঠকণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করার আকাঙ্ক্ষা যেমন অকস্মাৎ জেগে উঠতে দেখা যায়—সেইপ্রকার পাল মহাশয়ের বক্তৃতার কম্পন থামতে না থামতেই 'অমৃতবাজার' প্রমুখ তাঁর শিষ্য ও

ভক্তবৃন্দের চীৎকারে আকাশ বাতাস পূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে। এবং পাল মহাশয় যেমন আশা দিয়ে গেছেন—তাতে বিলাত-বাসীদের কর্ণকুহরও যে শীঘ্রই তাঁর কণ্ঠ-সঙ্গীতের দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে, তারও সন্দেহ নেই।

এখন কথা হচ্ছে আমরা জনসাধারণ—অর্থাৎ যারা রাজনীতি বা সমাজসংস্কার দুটির কোনটিকেই জীবনযাপনের ব্যবসা করে তুলতে পারি নি, সুতরাং এসব বিষয়কে তেমন অনাবশ্যক জটিলতার জালে আবৃত করে দেখবার অভ্যাস করি নি—আমরা কোন্ পথে যাব? নারী সম্বন্ধে আমাদের আদর্শ মহান্ ও সর্ব্বোচ্চ; তাদের অবস্থার কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নেই; কোন পাশ্চাত্য ভাবের সংযোগে তাদের জীবনকে উদ্বেলিত করার দরকার নেই; এবং পূর্ব্বাপর যেমন পুরুষের সঙ্গিনী অপেক্ষা তাদের দাসীস্বরূপেই তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে অশিক্ষিতা বন্দিনী অবস্থায় তারা জীবন যাপন করে আসছে; সেইভাবেই তাদের রাখবার চেষ্টা করা উচিত—পাল মশায়ের সাথে একযোগ হয়ে কি আমরা এইকথা প্রচার করে বেড়াব? না, লর্ড সিংহের মতে মত দিয়ে বলব—রমণীও পুরু-ষেরই ন্যায় স্বাধীন জীব; স্বাধীনভাবে তাকে বাড়তে দাও, শিক্ষা দাও; পুরুষ তার যে-সকল অধিকার জোর করে করতলগত করে রেখেছে, তা তাকে ছেড়ে দাও; অন্যত্র সুসভ্য দেশে যেমন, আমাদের দেশেও তেমনি পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে তারাও মানুষ হয়ে, জীবনযাত্রায় পুরুষের প্রকৃত সঙ্গিনী হয়ে দাঁড়াক। এ স্থলে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, লর্ড সিংহের উক্তির সরল অর্থ এই যে, এ-দেশের পুরুষ, নারীর উন্নতি সম্বন্ধে সংকীর্ণমনা, এবং অন্যান্য

দেশের স্ত্রীলোকেরা যে-ভাবে চলে' উন্নত হয়েছে, নিজ স্বার্থের দিকে চেয়ে আমরা তাদের সে পথে চলতে দিতে অনিচ্ছুক।

(৪)

পুরাকালে ভারতবর্ষে নারীর অবস্থা কিরূপ ছিল—সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলবার কি প্রয়োজন আছে? বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, চিরবৈধব্য, সতীদাহ প্রথা, অবরোধ প্রথা প্রভৃতি ত আমরা উত্তরাধিকারীসত্ত্বে অতীতের কাছথেকেই পেয়েছি। এ-ছাড়া সেকালে নিয়োগ প্রথা, রাক্ষস বিবাহ (কন্যাহরণ), আসুর বিবাহ (কন্যাক্রয়) প্রভৃতি ত শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবহার ছিল। একালে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ত আসুর বিবাহ আজও বজায় রয়েছে। আর সতীদাহ যে অপ্রচলিত হয়ে গেছে, সে ত ইংরাজের আইনের তাড়নায়। আজ একশ' বৎসর পূর্ব্বে এ-হেন প্রথাকেও সমর্থন করবার জন্য কখনো লোকের অভাব হয় নি, এবং বর্ত্তমান কালেও অশিক্ষিতা সহায়শূন্য বালবিধবা স্বামীর মৃত্যুর আশঙ্কায় বা মৃত্যুর পর উদ্বন্ধনে বা বস্ত্রে অগ্নিসংযোগের দ্বারা প্রাণত্যাগ করলে স্বামীর প্রতি হিন্দুনারীর জন্মগত প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি সম্বন্ধে সাময়িক সংবাদপত্রে যে প্রশংসা উচ্ছলিত হয়ে ওঠে, তাতে মনে হয় যদি ইংরাজরাজ ধর্ম্মের অঙ্গ বলে সতীদাহের প্রতি নিরপেক্ষতার ভাব অবলম্বন করে বসে থাকতেন—তাহলে এখনো এ প্রথা সজোরে প্রচলিত থাকত, এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ স্বদেশী বক্তাদের বিলেত গিয়ে এরও মাহাত্ম্য প্রচারের কোন বাধা থাকত না।

(৫)

বাবু বিপিনচন্দ্র ১৮৮২ সালের পূর্ব্বে ইংরাজ রমণীগণের দুরবস্থার বিষয় বলেছেন; কিন্তু এদেশে স্ত্রীলোকদের সম্পত্তি অর্জ্জন ও দান করবার অধিকার সম্বন্ধে যাঁরা একটু বিশেষ ভাবে চর্চ্চা করেছেন—তাঁরা জানেন, কি দুরবস্থা তাদের। প্রথমত, অশিক্ষিত অবস্থায় আজীবন গৃহে আবদ্ধ থাকার দরুণ, কোনও প্রকারে জীবিকা অর্জ্জন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। বাল্যকাল হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তারা পরমুখাপেক্ষী। এক সামান্য স্ত্রীধন লক্ষে একজনের কপালে জুটে ওঠে কিনা সন্দেহ, এবং তাও যদি যৌতুকস্বরূপ বিবাহকালীন দানে পাওয়া গিয়ে থাকে—তাতেই কেবল আছে তাদের দান বিক্রয়ের অধিকার। তা ব্যতীত প্রায় কোনও সম্পত্তিতেই তাদের নির্বূঢ় স্বত্ব আছে বলা যেতে পারে না। যতদিন স্বামী বর্ত্তমান, স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী; তার অবর্ত্তমানে সে দুর্ম্মুখ আত্মীয় বা পুত্রের মুখাপেক্ষী—আপন বলতে তার কোনও সম্পত্তিই নেই। একেও কি আদর্শ সুখের অবস্থা বলতে হবে?

পূর্ব্ববর্ণিত বিধিব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে—নিতান্ত সার্থান্ধ এবং 'শুধু পুরুষের সুখের জন্যই জগৎ সৃষ্ট' এই মন্ত্রের উপাসক ব্যতীত কেউ কি বলতে সাহসী হবে যে, ভারতে রমণীর প্রতি পূর্ব্বাপর সদ্ব্যবহার হয়ে আসছে?—মাতৃত্বের মহান ভাবকে কেন্দ্র করে যে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকারের ভাব সকল সমাজে বিকশিত হয়েছে—তারই বা প্রমাণ কোথায়? মোট কথা, নারীর অধিকার বলে একটা জিনিস আমাদের সমাজে স্থান পায় নি বল্লেও অত্যুক্তি হবে না।

অন্যত্রও যেমন, ভারতেও তেমন—মানুষ নিজের স্বার্থের দিক থেকেই

রমণীকে দেখেছে। রমণী যে chattel সদৃশ ক্রয় বিক্রয় ও অর্জ্জন করবার জিনিস—এ ভাব কি ভারতে, কি রোমে, কি গ্রীসে, কি অন্যত্র প্রত্যেক সমাজেরই আদিম অবস্থায় যে বিরাজ করত—ইতিহাসে তার বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে। মানুষ মেরুদণ্ডবিশিষ্ট (Vertebrate) প্রাণীশ্রেণীর অন্তর্গত—পশুপক্ষী যে-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যাঁরা এসব বিষয়ে পর্য্যালোচনা করেছেন, তাঁরা একমত যে, আদিম অবস্থায় পুরুষ ও রমণীর মিলন-বিষয়ে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। তবে সমাজের উন্নতির সঙ্গে এবং প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি ভাবের ক্রম-স্ফূরণের সঙ্গে সঙ্গে মানব ও ইতর প্রাণী সমাজের ভিতর নানা পার্থক্য দেখা দিয়েছে। প্রাচীন সমাজসকলের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে, কি ভারতে, কি অন্যত্র, বিপিন বাবু যাকে Sex ভাব বলেন—অর্থাৎ পুরুষ ও রমণীর মিলনের ভাব, তা হতেই কালক্রমে পরিবার পরিজন সম্বন্ধীয় অন্যান্য ভাবসমূহ বিকশিত হয়ে উঠেছে। এক-স্ত্রীগ্রহণ সভ্য সমাজের একটি বিশিষ্ট প্রথা কিন্তু এ প্রথা যে আমাদের দেশে এখনও তেমন বদ্ধমূল হতে পারে নি,—বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং কৌলিন্য প্রথার অস্তিত্বই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, কালক্রমে ভারতীয় সমাজে মাতৃত্বের ভাবটি যেমন ফুটে উঠেছে—এমন বোধহয় কোনও সমাজেই হয় নি। সর্ব্বত্রই মা ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র, কি[illegible]স্তু ভারতে তিনি শুধু তা নন,—তিনি প্রত্যক্ষ দেবী, ভগবতী; তিনি এ[illegible]বং পিতৃদেব প্রীত হলেই সর্ব্বদেবতা প্রীত হন। এই মাতৃত্বের ভা[illegible]বটি কালে এমন ভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে এখন নারীমাত্রেই ভারত-বাসীর চক্ষে মাতাবিশেষ। স্ত্রী আমাদের ধর্ম্মপত্নী—ধর্ম্মকার্য্যে

সঙ্গিনী। মনুতে লিখিত আছে, যে-গৃহে স্ত্রী যথোপযুক্তরূপে পূজিত না হয়ে থাকে, সেখান হতে লক্ষ্মী পলায়ন করেন—স্ত্রী শ্রীরই রূপান্তর। এইসবের দিকে দৃষ্টি করেই মনকে আমরা বোঝাচ্ছি যে, নারীর প্রতি ব্যবহারে আমরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হৃদয়ের উদারতা দেখিয়ে আসছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই? মাকে আমরা বিশেষ একটু ভক্তি করি বলেই, এবং 'পর-স্ত্রীষু মাতৃবৎ' ইত্যাদি শ্লোক নীতি-শাস্ত্রে স্থান পেয়েছে বলেই যে নারীর অধিকার সম্বন্ধে আমরা উদারমনা—প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ও দেশহিতৈষী কে সে কথা বলবে? মাকে ইউরোপীয়গণও কি ভক্তি করে না?—ইংরাজরা সাধারণত রমণীদের প্রতি গৃহে ও রাস্তাঘাটে যাদৃশ সম্মান দেখিয়ে থাকে, তার দিকে দৃষ্টি করে অনেকসময়ই কি আমাদের নিজ বিপরীত ব্যবহারের দিকে চেয়ে হেঁট-মুখ হয়ে থাকতে হয় না?

শাস্ত্রলিখিত শিক্ষা বিনাযুক্তি ও বিনা আপত্তিতে গ্রহণের ফলে এ দেশের রমণীদের অবস্থা কি শোচনীয় হয়েই দাঁড়িয়েছে! নেই বলতে কিছুই নেই তাদের। অর্থোপার্জ্জনের কোন সুযোগ নেই স্বাধীনতা নেই; এবং আজীবন রুদ্ধবায়ু-গৃহে বাসহেতু স্বাস্থ্য সামর্থ্যেরও অভাব। এক সতীত্বরূপ ডেমক্লেসের তরোয়াল সব সময়েই মাথার উপর ঝুলছে, যার দিকে চেয়ে চলতে ফিরতে তারা সর্ব্বক্ষণ সন্ত্রস্ত।

যা প্রাচীন তাকে প্রশংসা করাই এখনও সর্ব্বত্রই স্বদেশহিতৈষণার প্রকৃষ্ট পরিচয়, এবং যশোলাভের সহজ উপায়। তার উপর দুই এক জন ইংরাজ পুরুষ বা রমণী আমাদের প্রাচীন সভ্যতার উল্লেখ করে বাহবা বলে' মাঝে মাঝে পিঠ চাপড়িয়ে দিচ্ছেন, আর আমরা

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মনে করছি—আমাদের যা ছিল বা যা আছে, এমন কারো ছিল না বা হবে না। পতিত বা পতনোন্মুখ জাতির সর্ব্বত্রই এ অবস্থা—অতীতের দিকে অত্যধিক দৃষ্টি। আমরা কিন্তু লর্ড সিংহের সঙ্গে এক মত হয়ে বলবো—যতদিন না রমণীদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে, ততদিন ভবিষ্যৎ আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন, লম্ফঝম্ফ সবই নিষ্ফল। মা'র চরণে প্রণত হলেই তাঁর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনের পরাকাষ্ঠা হল, তা' আমরা মনে করি নে। পরিচ্ছদ ও গহনায় ভূষিত করলেই স্ত্রীর প্রতি সম্যক আদর দেখানো হয় না। এ সব হচ্ছে পুতুল-খেলা দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা। তাদের প্রকৃত মানুষ হবার জন্য আমরা কি করছি? লজ্জার ক্ষোভের বিষয় নয় কি—আমাদের স্বার্থ-যজ্ঞে তাদের শক্তি, বুদ্ধি, সুখ, মনুষ্যত্ব, আগাগোড়া ভস্মীভূত হয়ে আসছে? বনের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা এবং মানুষের ভিতর পুরুষ—স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে সকলেরই জীবন পূর্ণশ্রী লাভ করে, শুধু ভারতের নারীই নাকি শ্রীভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংসপথে অগ্রসর হয়। ভারতের পুরুষ! দেশ-শাসন ব্যাপারে সামান্য স্বাধীনতাটুকু লাভ করবার জন্য মাথা কুটে তুমি মরছ, ছট্‌ফট্ করে সাগরের ও-পারে যাচ্ছ আসছ;—কিন্তু নিজের ঘরের ভিতর তোমার আর এক মূর্ত্তি। সেখানে পূর্ণ আঁধারের ভিতর, অজ্ঞানতার ভিতর, তোমার মা, স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নীকে আবদ্ধ রেখে স্বদেশ-সেবার তুমি প্রকৃষ্ট পরিচয় দিচ্ছ! স্বদেশ তোমারই কেবল, তাদের কিছু নয়? প্রকৃতিদত্ত গুণে যারা তোমার অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়, তাদের স্বাধীনতা না দিয়ে মানুষ হবে—বৃথা এ জল্পনা কল্পনা তোমার। অশিক্ষিত মা'র পুত্র তুমি—অশিক্ষিত স্ত্রীর স্বামী—ঘর তোমার অজ্ঞানতার আঁধার,—

কুসংস্কারের স্তূপ। এবং সেই কারণে তুমি নিজেও যে কুসংস্কারের জড়পিণ্ড! অতীতের দিক হতে মুখ ফেরাও; মনু যাজ্ঞবল্ক্য ভুলে জগতের সঙ্গে চল; তবেই তুমি বড় হবে—নচেৎ নয়। সকল সুসভ্য দেশেই, নানাবিধ কুসংস্কার জয় করে রমণীর অধিকার বিস্তার লাভ করছে—শুধু ভারতেই কি তারা চিরকালের জন্য পতিত হয়ে থেকে তার উন্নতির পথ রুদ্ধ করে রাখবে?

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত।

২৫।৮।১৯

মেয়ের বাপ।

—:০:—

রাত প্রায় ১০টার সময় ট্রামে শ্যামবাজার থেকে ফিরছিলাম। রাস্তায় লোকচলাচল কমে এসেছিল—গাড়ীতেও ভিড় ছিল না। যত জোরে গাড়ী চলছিল তত জোরেই দখিণ হাওয়া মুখের উপর এসে লাগছিল। আরামে চোখ বুজে আসছিল।

হাতিবাগানের মোড়ে একটি ভদ্রলোক উঠে আমারই পাশে তাঁর পরিচিত একজনকে দেখে আলাপ আরম্ভ করে দিলেন।

—এই যে কিরণ বাবু! নমস্কার মশাই, কেমন আছেন?

—নমস্কার নবীন বাবু! তারপর আপনাদের খবর সব—

—ভাল আর কই? মেয়ের বিয়ের ঠিক আজও কোথাও করে উঠতে পারি নি, সেই ধান্ধায়ই ঘুরচি। আপনি ত কাজ জিতে নিয়েছেন মশাই।

—আপনাদের কল্যাণে কোনরকমে দু'হাত এক হয়ে গিয়েছে।

একটু থেমে নবীন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—

—তা খরচপত্র কত হ'ল?

—সব সুদ্ধ আড়াই হাজারের উপরে বই নীচে নয়। মেয়ে জামাইকেই ত দু'হাজার দিতে হয়েছে।

—আঃ, তার কমে কি আর মেয়ের বিয়ে হয় এখনকার দিনে? সে যাহোক, নির্ভাবনা হয়েছেন আপনি, বেঁচেছেন, বুকের পাথর নেবে গিয়েছে।

খিন্নস্বরে কিরণ বাবু বল্‌লেন—তা আর নাম্‌ল কই মশাই—

নবীনবাবু একটু অপ্রস্তুতভাবে তাঁর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—মেয়ে জামাই ভাল আছে ত?

—বেঁচে আছে বটে, কিন্তু ভাল নেই। পয়সাকড়ির যেখানে অনটন, সেখানে ভাল থাকা যায় কি?

—কেন আপনার জামাই ত B.A., আর শুনেছি চাকরি-বাকরিও করেন।

—তা করেন, কিন্তু—

—এত কিন্তু করলে চলবে কেন ভাই, চাকরি ছাড়া জমিদারী আর ক'জনের থাকে?

—কিন্তু বাড়ীটা ঘরটা ত থাকে।

—তা নেই না কি?

—সে না থাকারই মধ্যে। পুরোণো সরিকি বাড়ী একটু আছে, তাও দেনায় ডোবানো।

—বেহাই দেনা করে রেখে গিয়েছেন বুঝি?

—সে অনেক কথা ভাই, আর সে সব কথা আলোচনা করলে ত এখন কোন লাভ নেই।

—তা সত্যি। কিন্তু বিয়ের আগে এই দেনার বিষয় কিছু জানতে পারেন নি?

—তা পারলে কি আর এমন কাজ করি? দেখলাম ছেলেটি ভাল। পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি করেই বিয়েটা দিয়ে ফেল্‌লাম। কে জানে তার ফলে এই হবে?

—না মশাই, আমার মনে হচ্ছে আপনার মেয়ের বিয়ে ভালই হয়েছে। ছেলে ভাল দেখে দিয়েছেন ত—বাস্ আপনার কাজ হয়ে গিয়েছে। এখন মেয়ের বরাৎ।

—কিন্তু তা বলে ত মন বোঝে না।

—কিন্তু এ রকম ভাবাও ঠিক নয়। আর তাও বলি, বিয়ে ত দিয়েছেন এই সে দিন, এরই মধ্যে জামাই কি মাতব্বর হয়ে উঠবে? এখন তার বয়সই বা কি?

—বয়স কম হয়নি—চুল-টুল পেকেছে দু'একটা।

—চুল পাকার কথা আর বলবেন না। আমার সম্বন্ধীর ছোট ছেলে—তার বয়স এই ১৫ কি বড়জোর ১৬ হবে, কিন্তু এরই মধ্যে তার মাথার অর্দ্ধেক চুল পেকে গিয়েছে।

তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য্য হই কি না দেখবার জন্যই বোধ হয় নবীন বাবু গল্প শেষ করে' একবার চকিতের মত আমার দিকে চাইলেন, এবং তখনই মুখ ফিরিয়ে একটু মুরুব্বিয়ানা করে কিরণ বাবুকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আপনার জামাইয়ের বয়স ২৫।২৬ হবে, কেমন?

—তার বেশি হবে। দ্বিতীয় পক্ষ কি না, বয়স একটু বেশিই হয়েছে, বোধ হয় বছর ত্রিশেক হবে।

—আঃ, ত্রিশ বছর আবার বয়স! কত লোকের যে ও বয়সে প্রথম বিয়েই হয় না। দ্বিতীয় পক্ষ যা বলচেন তা—

—সে ত আমি জেনেই দিইচি।

—ছেলে পিলে আছে কি সে পক্ষের?

—একটি মেয়ে আছে।

—তা সে জন্যই বা ভাবনা কি? মেয়ে—বিয়ে হলেই পরের ঘরে যাবে। ভাবনা হ'ত যদি একটা ছেলে থাকত।

—সে জন্যও আমি ভাবছি নে নবীন বাবু। আমি ভাবছি এই দিনকাল, তাতে সামান্য চাকরি করে' সে সংসারধর্ম্ম করবে কি করে? তার উপর দেনা যা আছে সে ত গোকুলে বাড়ছে।

—আপনি মিছিমিছি ভাবছেন এই দেনার জন্য। এ ত আপনার ভাববারই নয়, তার উপর দেখুন, দেনা নেই কার? রাজা মহারাজারা পর্য্যন্ত দেনদার। শরীরটা ঈশ্বর ইচ্ছায় ভাল থাকলে, ছেলেমানুষ ও-দেনা শোধ দিতে ওর ক'দিন লাগবে?

—তাই শরীরটাই কি ছাই ভাল? অম্বলের অসুখ ত লেগেই—

—অম্বল ত আমরা অসুখের মধ্যেই ধরি নে, মশাই। অম্বল নেই কার? ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে—কি বলেন মশাই আপনি?—বলিয়া মধ্যস্থ মানার ভাবে ভদ্রলোক আমার দিকে চাইলেন। কোন উত্তর না করে আমি শুধু বিজ্ঞের মত হাসতে লাগলাম। সেই হাসির ইঙ্গিত অনুমান করে প্রসন্নমনে ভদ্রলোক তখনই কিরণ বাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—জামাইরা আপনার ক' ভাই?

—ভাই-টাই আর কেউ নেই, থাকবার মধ্যে আছে এক মামা, কিন্তু তার সঙ্গেও বনিবনাও নেই।

—আজকালকার ধরণই হয়েছে ঐ, নিজে নিজে থাকতে চায়, মামা কি বাবাকে পর্য্যন্ত কেয়ার করে না।

কিরণ বাবু চিন্তিত ভাবে বললেন—সেই সব দেখেশুনেই ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে। তাই ত এখন ভাবি, সেই অত দেরীই

যখন হয়েছিল, আরও না হয় দু'মাস দেরী হত! মনের মত একটি ছেলেও পাওয়া গিয়েছিল—আজও তার বিয়ে হয় নি।

—আচ্ছা দেখুন কিরণ বাবু, সে সম্বন্ধটা আমায় করে দিতে পারেন?

—আপত্তি কি, সে ছেলে পছন্দ করবেন?

—কি যে বলেন আপনি? কানা খোঁড়া না হয়, এমন একটি পেলেই বাঁচি আমি, আর আপনি বলচেন কি না অমন ছেলে পছন্দ করব কি না?

—তা ছেলেটি ভাল, পছন্দ হওয়ার মত বটে। এদিকে পয়সা কড়িও চায় না তারা।

—দেখো ভাই কোন দোষ টোষ নেই ত লুকোন? এখনকার দিনে যে—

—দোষ থাকবে কোথায়? ছেলে দেখতে শুনতে ভাল—অবস্থার ত কথাই নেই—

—স্বভাব চরিত্র?

—বলছি যে তেমন ছেলে শতকরা একটা পাওয়া যায়। তামাকটি পর্য্যন্ত ছোঁয় না সে—

—চাকরি বাকরি করে ত?

—চাকরি করতে যাবে কেন? বাপ তার যা রেখে গিয়েছে, বুঝে চলতে পারলে তিন পুরুষ চাকরি করতে হবে না।

—বুঝে চলতে পারবে ত?

—পারবে না? এই ত দু'বছর বাপ মরে' গিয়েছে, এরই মধ্যে কত আয় বাড়িয়েছে জানেন?

—আচ্ছা লেখাপড়া কতদূর করেছে?

—তা পাশ টাশ কিছু করে নি, তবে লেখাপড়া জানে। এখনো পড়াশুনো করে শুনেছি।

—বাঙলা নভেল নাটক পড়ে বোধ হয়।

—তা জানি নে, কিন্তু শুনেছি সেই উদ্যোগ করে একটা নূতন ইংরাজি স্কুল করিয়েছে দেশে।

—দেশে?—কোথায় সে?

—এই হুগলী জেলায়—

—ও হরি! কলকাতায় নয়?

—না, কলকাতায় নয়।

—ওঃ, সেই পাড়াগাঁয় ম্যালেরিয়ার মধ্যে—বাপ রে!—বলতে বলতে ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে ট্রাম থামাবার জন্য শিকল টানতে টানতে বললেন—মাপ করবেন কিরণ বাবু, কথায় কথায় বাড়ীর রাস্তা অনেক দূর ফেলে এসেছি দেখছি। অনুমতি হয়ত এইবার নামি—নমস্কার কিরণ বাবু, নমস্কার মশাই!—ভদ্রলোক নেমে পড়লেন। কিরণ বাবু অবাক হয়ে তাঁর পথের দিকে চেয়ে রইলেন—এতক্ষণের মুলতুবি হাসিটাও আমার মনের মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ।

মিলনাকাঙ্ক্ষা।

—:*:—

তোমারে বেসেছি ভাল—এই কথাটুক
ধ্বনিয়া উঠিছে মোর সুখে, বেদনায় ;
জন্মান্তের বাসনাটী প্রেম-সাধনায়
স্মৃতি রূপে জাগি' মোর জ্বলি' উঠে বুক।

তোমারে বেসেছি ভাল—তাই চাহি আজ
স্বপ্ন সাথে বাস্তবের নিবিড় মিলন,
অশরীরি শরীরির গাঢ় আলিঙ্গন—
নগ্নতার আবরণে ঢাকি দিয়া লাজ।

রূপেতে অরূপ পূজা—মিলন-দুয়ারে,
নব সৃষ্টি তরে দিব বলি আপনারে।

খোল দ্বার—আজি মোর সাধনার শেষ,
পূর্ণাহুতি দিব আজি সর্ব্ব ভয় লাজ।
দেবতা—পরাব তারে কামনার বেশ,
সৃজন-রহস্যে ঘেরা মন্দিরের মাঝ।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

বিরহাকাঙ্ক্ষা।

—:*:—

তোমারে বেসেছি ভাল—তাই জাগে ভয়,
মিলনের রজনীতে যদি বাহু ডোর
শ্লথ হ'য়ে খ'সে পড়ে কণ্ঠ হ'তে মোর,
অবসাদ-খিন্ন প্রেম পায় যদি লয়—

প্রণয়েতে করি তাই বিরহ আরোপ,
তৃপ্তি কেবা খুঁজি ফিরে অতৃপ্তির পুরে ?
মিলনের মূর্চ্ছনাতে কোন্ নব সুরে
আসন্ন বিরহভয় করি দিবে লোপ !

বিরহ-সাধনে চাহি করিবারে জয়
মিলনের অবসাদ, বিরহের ভয়।

তবে আসিও না আজ কমমূর্ত্তি ধরি',
দূরে রহি' বাঞ্ছিতেরে শুধু ভালবেসো ;
মিলনে ক্ষণিক তৃপ্তি,—দিবা বিভাবরী
অমূর্ত্ত রূপেতে তুমি কল্পনাতে এসো।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

সোহাগ।

—:০:—

কুরূপ কেন বলিস্ তোরা আমার খোকায় বল্ ?
রূপ ত তোরা চিনিস্ নারে নিন্দুকেরি দল।
রঙটি কালো, বয়েই গেল, ওই ত ভাল ঠিক,
কালো তোদের কৃষ্ণ কালী, ভ্রমর এবং পিক।
নাকটি চাপা, শোন্‌রে ক্ষেপা, দেখেই দিগম্বর,
গরুড় পাখা আস্‌তে নারে, পলায় পেয়ে ডর।
শুন্‌বি তোরা, নাইক কেন, ইহার চোখে টান ?—
টান কে দেবে, ধনুক ফেলে মদন পেলে প্রাণ।
কানটি নহে গৃধ্রসম, তাতেই যত দোষ,—
অমঙ্গল যে দেখলে পরে বাড়বে শিবের রোষ।
দন্ত নহে মুক্তাপাঁতি, তাতেই যত দায়,—
কুবেরকে দেয় মাণিক ফেলে, মুক্তা সে কি চায় ?
নয়কো কটি সিংহসম, তাই কি কভু হয় ?—
সিংহ তাহার চিরদিবস পায়ের তলে রয়।
সদাই কাঁদে, ক্ষণে ক্ষণে, করে নূতন ছল,—
জটায় শুধু ধরবে কেন মন্দাকিনীর জল !
বলচি আমি—যতই পারিস নিন্দা তোরা কর্,
করছে উমা তপস্যা ঘোর, কিন্‌তে এমন বর !

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কবি

—:*:—

কিশোর-কবির তন্দ্রালস চোখের সামনে স্বপ্নদেবী তার প্রিয়ার রূপটীকে একটু একটু ক'রে ফুটিয়ে তুললে। তারপর পাপড়ি-খসা ফুলের মতো রূপটী শূন্যে মিলিয়ে গেল। রেখে গেল শুধু একটী মাধুর্য্যের স্মৃতি—ঝরা ফুলের গন্ধটুকুরই মতো।

কবি জেগে উঠল। কল্পনাদেবী তখন তার কানে কানে ব'ললে—কবির তৃষিত হৃদয় সে স্নিগ্ধ করে দেবে—তার প্রেমে; কবির দৈন্য, লজ্জা, ভয় সে দূর ক'রে দেবে—তার ত্যাগে; কবির জীবন পূর্ণ ও সার্থক হ'য়ে উঠবে—একমাত্র তারই সঙ্গে মিলনে।

কবি সেই স্বপ্নলব্ধার সন্ধানে বেরুল—অরণ্যে নয়, পর্ব্বতে নয়, স্রোতস্বিনীর তীরেও নয়, নির্ঝরিণীর ধারেও নয়—তাকে খুঁজে ফিরতে লাগল—পৃথিবীর পরিচিত-অপরিচিতের মধ্যে, সমাজের বিলাস-ব্যসনের মধ্যে, শ্মশানের শোক-নীরবতার মধ্যে।

কিন্তু কোথাও তার দেখা মিল্‌ল না।

* * * *

এমনি ক'রে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল। কবি কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে প'ড়ল।

তার খোঁজার বিরাম ছিল না।

কত বরাননী কবির পথে এসে দাঁড়াত। ব'লত—আমিই তোমার সেই প্রিয়া।

সন্ধান-ক্লান্ত কবি মনে ভাবত—হয়ত বা এ-সেই। মুখে ব'লত—দেবি! আমার জীবন সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ল।

দিনের পর দিন—হয়ত বা মাসের পর মাস কেটে যেত।

নারী একদিন ব'ল্‌ত—তৃষ্ণা মিটেছে কি?

কবি ব'ল্‌ত—না।

নারী ব'ল্‌ত—আমার মিটে গেছে। তুমি এইবার যাও।

কবি চ'লে যেত। তার ভাঙ্গা বুকের চোয়ানো রক্তে গোলাপ লাল হয়ে উঠত; তার বিষণ্ণ মুখের করুণ হাসিতে জ্যোৎস্না ম্লান হ'য়ে আস্‌ত।

সমাজ গলা উঁচু ক'রে ব'ল্‌ত—ছিঃ ছিঃ!

কবি মাথা নীচু ক'রে ভাবত—তাইত!

* * * *

কবির যৌবনও ফুরোল, কবিও শয্যা গ্রহণ ক'রলে।

মৃত্যুদেবী শিয়রে এসে ব'স্‌ল।

কবি জিজ্ঞাসা ক'রলে—এইবার তাকে পাব ত?

মৃত্যুদেবী ব'ললে—এখনও নয়।

কবি ক্লান্তস্বরে ব'ললে—আর কতদিন তাকে খুঁজে ফিরতে হবে?

মৃত্যুদেবী শান্তস্বরে উত্তর ক'রলে—সৃষ্টি যতদিন।

কবির চোখ বুজে এল। তার শেষ নিঃশ্বাসটা সৃষ্টিরই মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

উন্মাদয়ন্তী জাতক।

(জাতকমালা হইতে অনূদিত)

——:*:——

"তীব্র দুঃখে অভিভূত হয়েও সাধুজন আপনার অটুট ধৈর্য্যবলে নীচমার্গের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ হয়ে থাকেন"—লোকমুখে এইরূপ শোনা যায়। যথা:—

একসময় বোধিসত্ত্ব শিবিদের রাজা ছিলেন। তাঁর মধ্যে সত্য, ত্যাগ, প্রজ্ঞা ও বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণের আতিশয্য থাকায়, তিনি লোকহিত সাধনে চির উদ্যোগী ছিলেন। মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম ও বিনয়রূপী সেই রাজা সর্ব্বদা প্রজাবর্গের উপকারে প্রবৃত্ত থাকতেন।

প্রকৃতিপুঞ্জের চিতে দুষ্টভাব না আসিতে দিয়া,
গুণের গরিমাবশে হৃদয় তাদের বিকাশিয়া,
পিতা যথা তনয়েরে উভলোকে আনন্দিত করে,
সেইমত ক্ষিতিপতি পালিতেন প্রকৃতিনিকরে।

দণ্ডনীতি ছিল তাঁর চিরকাল ধর্ম্ম-অনুগামী,
পরিজন পরজন দুয়েরি সমান শুভকামী।
অধর্ম্মের পথ সদা আবরিয়া সকল প্রজার,
হইয়াছিলেন তিনি স্বর্গের সোপান সবাকার।

ধর্ম্মপালনেতে মাত্র লোকহিত ঘটে জানি মনে,
অনুরক্ত ছিলা তাই চিরকাল ধর্ম্ম-আচরণে।
সকলপ্রকারে সদা ধর্ম্মপথে করি বিচরণ—
অপরে লঙ্ঘিলে ইহা, কভু নাহি সহিত রাজন ॥

সেই রাজার একজন পৌরজনের পরম রূপলাবণ্যবতী একটি কন্যা ছিল। তাকে দেখলে শ্রী, রতি, অথবা অপ্সরাগণের একজন বলে মনে হত। সবার মতেই, সে ছিল পরম দর্শনীয়া স্ত্রীরত্ন।

বীতরাগ জন ছাড়া, আঁখিপথে আর সবাকার,
অনুপম তনু সেই চকিতে পড়িলে একবার,
নয়ন অমনি সেই রূপের রসিতে বাঁধা পড়ে—
নড়িবে কি, শক্তি নাই তারাটি যে এক তিল নড়ে!

সেইজন্যে বান্ধবেরা তার নাম রাখলে উন্মাদয়ন্তী। তার বাপ একদিন রাজাকে গিয়ে জানালেন—"দেব! আপনার রাজ্যে একটি স্ত্রীরত্ন প্রাদুর্ভূতা হয়েছে, আপনি ইচ্ছামাত্রেই তাকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করতে পারেন"।

রাজা স্ত্রী-লক্ষণবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে আদেশ করলেন—"আপনারা গিয়ে দেখে আসুন মেয়েটি আমার গ্রহণযোগ্যা কি না"। মেয়ের বাপ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে গেলেন। বাড়ী গিয়ে তিনি উন্মাদয়ন্তীকে বল্লেন—"ভদ্রে, তুমি নিজ হাতে এঁদের পরিবেশন কর"। বাপের আদেশমত সে ব্রাহ্মণগণকে পরিবেশন করতে প্রবৃত্ত হল। তখন সেই ব্রাহ্মণদের—

চাহিয়া সেই বয়ান পানে নয়ান নিশ্চল!
মদনহত ধৈর্য্য সবে অবশ বিহ্বল।
মাতাল সম সংজ্ঞাহারা হইল একেবারে,
আপন আঁখি মনেরে তারা সম্বরিতে নারে!

খাওয়া ত দূরের কথা—ধীরস্থিরভাবে বসে থাকতে পর্য্যন্ত তাঁরা পারলেন না। তখন গৃহস্বামী মেয়েকে তাঁদের সুমুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে, স্বহস্তে পরিবেশন করে তাঁদের খাইয়ে দাইয়ে বিদায় করলেন।

পথে এসে ব্রাহ্মণেরা বিচার করতে লাগলেন—মেয়েটির রূপ ঠিক যেন প্রতিমার মতন, দেখ্‌বামাত্রই মোহিত হতে হয়। এক্ষেত্রে, পত্নীরূপে গ্রহণ করা ত দূরের কথা—একে দেখাও রাজার উচিত নয়। এর এই রূপচাতুর্য্য রাজার হৃদয় উন্মত্ত করে তুল্‌বে, আর তিনি সেই রূপশোভায় মত্ত থেকে ধর্ম্মকার্য্য ও রাজকার্য্য সম্পাদনে শিথিলপ্রযত্ন হয়ে পড়বেন; এইরূপে রাজকার্য্যসাধনে কালাতিক্রম হওয়ায়, প্রজার সুখোদয় ও হিতসাধনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

ইহারে দরশ করিবামাত্র মুনিরও সাধনে বিঘ্ন হয়,
রাজা ত যুবক, সুখেরি সেবক, আগে হতে ভাবে মজিয়া রয়।

এইরূপ মনে মনে স্থির করে তাঁরা উপযুক্ত সময়ে রাজার সঙ্গে দেখা করে বল্‌লেন—"মহারাজ! মেয়ে ত দেখে এসেছি। মেয়েটির রূপচাতুর্য্য যথেষ্টই আছে, কিন্তু তার অপলক্ষণও আছে;—এবং সে লক্ষণের ফল হচ্চে, অপঘাত। সেইজন্যে মহারাজের তাকে চোখে দেখাও অবিধি—পত্নীত্বে গ্রহণ করা ত দূরের কথা।

যেমন করিয়া সমেঘা যামিনী চাঁদেরে লুকায়ে রেখে,
ধরা আকাশের শোভা শৃঙ্খলা একেবারে দেয় ঢেকে,
ঠিক সেইমত নিন্দিতা হয় রমণী যে দেয় নাশি
স্বামী ও শ্বশুর উভয় কুলেরি যশ ও বিভুতিরাশি।

এইসব শোনবার পর, "এই অলক্ষণে নারী আমার কুলের অনুরূপ হবে না" ভেবে রাজা তার প্রতি নিরভিলাষ হলেন।

এদিকে সেই গৃহস্থ, রাজা তাঁর মেয়ের প্রার্থী নন জেনে, অভিপারগ নামক রাজারই একজন অমাত্যকে কন্যাসম্প্রদান করলেন। তারপর একদিন কৌমুদী-উৎসবের কাল আগত হলে, নিজ রাজধানীতে উৎসবশোভা দেখবার জন্য রাজার মন উৎসুক হল,—চমৎকার একটী রথে আরোহণ করে তিনি নগরভ্রমণে বেরলেন। বেরিয়ে তিনি দেখতে পেলেন—রাজপথসকল জলসেচনে সিক্ত ও সুমার্জ্জিত হয়েছে, চারপাশের দোকানগুলি ধ্বজপতাকায় সুসজ্জিত হয়েছে, নিক্ষিপ্ত ফুলে পথের মাটি সাদা হয়ে গিয়েছে; ফুলের মালা, মদিরা, ধূপ ও স্নানীয় অনুলেপনের (প্রভৃতির) গন্ধে বাতাস সুরভিত, হাস্যে লাস্যে ও বাদিত্রের ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত, বিবিধ পণ্যরাশিতে ভরা প্রসারিত রাজপথ উজ্জ্বলবেশধারী পুষ্টদেহ তুষ্ট নাগরিকগণে আকীর্ণ হয়েছে। এই সব দেখতে দেখতে রাজা সেই অমাত্যের বাড়ীর সুমুখে এসে পড়লেন।

এদিকে অলক্ষণে বলে রাজা তাকে ত্যাগ করায়, উন্মাদয়ন্তীর মনে বেশ একটু রাগ ছিল। রাজদর্শনেই যেন একান্ত কুতূহলী—এই ভাব দেখিয়ে, আপনার রূপশোভা যাতে রাজার চোখে পড়ে সেই উদ্দেশ্যে,

মেঘের শিখরে বিদ্যুতের মত হর্ম্ম্যতল উদ্ভাসিত করে সে দাঁড়িয়ে ছিল,—আর মনে মনে ভাবছিল, আচ্ছা দেখি একবার এই অলক্ষণেকে দেখে ইনি স্মৃতি ও ধৃতি অবিচলিত রেখে নিজেকে ধারণ করতে পারেন কি না। রাজা সেই বাড়ীটীর শোভাসন্দর্শনে কুতূহলী হবামাত্রই সহসা তাঁর দৃষ্টির অভিমুখে স্থিতা উন্মাদয়ন্তীকে দেখলেন। তখন—

আপন অন্দরে নিতি সুন্দরীদলের
শরীরবিলাসে যাঁর তিরপিত আঁখি,
ধর্ম্মে চির অনুরাগী, ইন্দ্রিয়বলের
বিজয়ে নিরত যিনি, অনুদ্ধত থাকি;
সুবিপুল ধৃতিগুণ যাঁহার ভিতর,
পরযুবতীতে যাঁর নয়ন বিমুখ—
এ হেন রাজাও হয়ে মদনে কাতর,
অনিমেষ চোখে তারে নেহারে উৎসুক!

আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন—

এ বালা কি ঐ গুহেরি দেবতা, অথবা জমাট চন্দ্রকর?
মানবী ত নহে, দেবী কি দানবী আসিয়াছে এই ধরণী 'পর?

তাকে দেখে অতৃপ্তনয়ন রাজা যখন এই ভাবে মনে মনে আলোচনা করছিলেন—তখন রাজরথ তাঁর মনোরথের একটুও অনুকূল না হয়ে সে স্থান অতিক্রম করে চলে গেল। সেই রমণীর প্রতি একাগ্রমনা রাজা, শূন্যহৃদয়ে স্বভবনে উপনীত হয়ে, গোপনে সারথী সুনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"শ্বেত প্রাচীরেতে বেষ্টিত সেই গৃহটি কি তুমি চেন ?
কেবা সে, দাঁড়িয়েছিল যে শুভ্র মেঘেতে বিজলি হেন ?"

সারথী বল্‌লে—'দেব! অভিপারগ নামে আপনার একটি অমাত্য আছেন, ওটি তাঁরই বাড়ী। আর যাঁকে দেখেছেন, তিনি হচ্ছেন তাঁরি স্ত্রী, কিরীটবৎসের মেয়ে। নাম উন্মাদয়ন্তী।' এই কথা শুনে তাকে পরস্ত্রী জেনে রাজার মন ব্যাকুল হল, চিন্তাভারে তাঁর চোখ নিমীলিত হয়ে পড়ল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তদর্পিতমনা রাজা আত্মগত হয়ে বল্‌তে লাগলেন—

মৃদু সুমধুর হাসিতে যে মোরে উন্মাদসম করেছে,
রম্য আখরনিকরে ভরিয়া যেইজন আহা গড়েছে
'উন্মাদয়ন্তী' এ নাম তাহার, করেছে যা হওয়া উচিত তাই,
পাগল যে জন করে, নাম তার কিছু আর নাহি খুঁজিয়া পাই।

পাশরিতে ইচ্ছা করি বটে,
হৃদয়ে দরশ তারি ঘটে!
অথবা আমার এই মন
তারি মাঝে রয়েছে মগন!
আবার কখনো মনে লয়—
এ মনের প্রভু সে নিশ্চয়!

পর-রমণীতে মম এত অধীরতা,—
উন্মাদ হয়েছি আমি হায়!
ঘুম ত গিয়েছে মোরে একেবারে ছেড়ে,
লজ্জাও কি ত্যেজিল আমায়?

দেহের বিলাসে তার, হাসিভরা চাহনীর মাঝে,
অনুরাগে ভরা মম মন যবে বিরাজে নিশ্চল,
তখন অপর কাজে ডাকিতে কাঁসর যেই বাজে—
সে কাজের প্রতি মোর মন হয় বিদ্বেষ-বিকল।

এইরূপে মদবিচলিত-ধৈর্য্য হলেও রাজা তাঁর চিত্তকে ব্যবস্থিত করলেন বটে, কিন্তু তাঁর শরীর দিন দিন ক্ষীণ ও পাণ্ডু হতে লাগ্‌ল। চিন্তাকুলিত ভাব আর দীর্ঘশ্বাসত্যাগ প্রভৃতিতে তাঁর আকৃতিতে কামকাতরের ভাব ব্যক্ত হয়ে পড়ল।

যদিও,

মহান্ ধৈর্য্যের বলে আপনার মনের বিকার
গোপন করিলা নরবর,
চিন্তায় স্তিমিত আঁখি, শরীরের কৃশতায় তাঁর,
ব্যক্ত তাহা হইল সত্বর।

আকার ইঙ্গিত লক্ষ্য করে লোকের মনের ভাব বুঝে নিতে রাজার সেই অমাত্য অভিপারগ ছিলেন খুব একজন নিপুণ ব্যক্তি। রাজাকে দেখে, কি যে তাঁর ঘটেছে তা অভিপারগের বুঝতে বাকী রৈল না। রাজার এ অবস্থা হবার কারণটি তাঁর বোধগম্য হওয়ায়, এতে রাজার অনিষ্ট ঘট্‌তে পারে এই আশঙ্কায় তাঁর মন শঙ্কিত হল; কারণ রাজাকে তিনি স্নেহ করতেন, এবং অতি বলশালী মদনের প্রভাবে মানুষকে যে কি হতে হয়, তাও তাঁর জানা ছিল। তারপর রাজাকে গোপনে কিছু জানাবার জন্যে তাঁর কাছে তিনি উপস্থিত হলেন, এবং রাজাকর্ত্তৃক কৃতাভ্যনুজ্ঞ হয়ে বল্‌তে লাগলেন—

দেব আরাধনে, হে নরদেবতা, আজিকে যখন আছিনু রত,
অম্বুদ-আঁখি যক্ষ সে এক হইল আমার সমীপগত।
কহিল আমারে, ওগো তুমি কেন দেখিছ না আঁখি মেলিয়া চাহি,
উন্মাদয়ন্তীপ্রতিনিবিষ্ট নৃপের হৃদয়ে শান্তি নাহি।

এই কথা বলে যক্ষ চকিতে হইল তিরোহিত,
সেই হতে, ওহে দেব, বিষাদ ঘিরেছে মোর চিত।
যাহা সে বলিয়া গেল, যদি প্রভু ঘটে থাকে তাই,
প্রসাদপ্রয়াসীজনে আজো তবে কেন বল নাই ?

অতএব আমাকে অনুগৃহীত করবার জন্যে উন্মাদয়ন্তীকে এখন আপনার গ্রহণ করা উচিত। তাঁর এই প্রস্তাবে রাজা লজ্জানতবদন হলেন। মদনবশগত হলেও চিরাভ্যস্ত ধর্ম্মবলে তিনি কখনো ধৈর্য্যচ্যুত হন নি। তিনি স্পষ্টাক্ষরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বল্‌লেন—না, তা হতে পারে না, কেন না :—

আমিত অমর নহি,—পুণ্য হতে হইব পতিত,
তারপর পাপ এই সবাকারই হইবে বিদিত।
আর, তার বিরহেতে হিয়া তব পুড়ে হবে ক্ষীণ,
জ্বলিয়া জ্বলিয়া যথা তৃণ হয় অনলে বিলীন !

উভয় লোকেরি ঘটে অহিতসাধন
যেহেতু, অবোধে শুধু করে হেন কাজ।
একমাত্র সেইহেতু ভ্রমে কদাচন
নাহি করে সেই কর্ম্ম পণ্ডিতসমাজ।

অভিপারগ বল্‌লেন—দেব ! এতে আপনার ধর্ম্ম অতিক্রমের কোনই আশঙ্কা নেই, কেননা :—

আমি যে করিব দান, তাহাতে সাহায্য বিতরিয়া
ধর্ম্মলাভই হইবে তোমার,
না করি গ্রহণ তারে, বিঘ্ন মম দানে আচরিয়া
অধর্ম্মই হইবে সঞ্চার।

হে দেব ! এতে আপনার কীর্ত্তির উপরোধকও আমি কিছু দেখছি নে।

আমি আর তুমি ছাড়া এ বিষয়
জানিবে না কভু অন্য কেও,
অতএব, জন-অপবাদ ভয়,
করিতে হবে না শঙ্কা সেও।

আর এ কার্য্যে আমাকে পীড়া দেওয়া ত হবেই না, অনুগৃহীতই করা হবে। কারণ—

প্রভুর স্বার্থচর্চ্চাজনিত তুষ্টিভরা যে চিত্ত,
আঘাত বেদনা কোথায় সেখানে রয়,
অতএব দেব, নিভৃতে কামের সুখভোগ কর নিত্য,
মোরে পীড়নের শঙ্কা সে কিছু নয়।

রাজা বল্‌লেন—ছিছি, এ পাপ কথা আর নয় !

সকল দানেতে ওগো ধর্ম্মের সাধন নাহি হয়,
মোর প্রতি অতি স্নেহে তুমি না ভাবিছ এ বিষয়।

আমার উপর যেবা অতিশয় স্নেহে
নাহি চায় পানে আপনার,
এ হেন পরম বন্ধু, এ হেন যে সখা,
তার প্রিয়া সখী যে আমার।

অতএব আমাকে এরূপ প্রতারণা করা আপনার উচিত নয়। আর এ বিষয় অপর কেউ জানবে না বলেই কি পাপ হবে না?

আদেখায় নিসেবিত বিষের সমান
গোপনে আচরি পাপ, কেবা সুখ পায়?
দেবতা ও যোগী, যারা নির্ম্মল-নয়ান,
তারা নাহি দেখে—হেন কি আছে ধরায়?

আরো দেখুন—

নহে সে যে তব প্রিয়া, হায়,
প্রত্যয় করিতে কেবা পারে!
ত্যেজি তারে তুমি বেদনায়
দহিবে না, বুঝাইবে কারে?

অভিপারগ বল্‌লেন—

দারাপুত্র সহকারে আমিত তোমারি দাস,
দেবতা আমার তুমি প্রভু,
সেও ত তোমারি দাসী, অতএব ধর্ম্মনাশ
ইথে তব না হইবে কভু।

হে কামদ, দিছ তুমি মোরে বহু কামনার ধন,
আমার প্রিয়ারে আজি তোমারে করিব সমর্পণ।
ইহলোকে প্রিয় যাহা তাহাই করিয়া দান, নরে,
রমণীয় প্রিয় যাহা পরলোকে তাহা লাভ করে।

অতএব, হে দেব, আপনি তাকে গ্রহণ করুন।

রাজা বল্‌লেন—না, তা, হ'তে পারে না, কোনক্রমেই না। কেন?—

লেলিহান হুতাশনে মরিব পুড়িয়া,
অথবা মরিব খর তরবারি ঘায়,
যেবা শ্রী লভিনু চির ধর্ম্ম আচরিয়া,
শক্তি নাহি মোর করি পীড়ন তাহায়।

অভিপারগ বল্‌লেন—আমার ভার্য্যা বলেই দেব, যদি তার প্রতিগ্রহণে অনিচ্ছুক হয়ে থাকেন, তাহলে আমি তার প্রতি সর্ব্বজনের অভিলাষের অবিরোধী বেশ্যাব্রতের আদেশ করব, তারপর তাকে আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা বল্‌লেন—আপনি কি পাগল হয়েছেন!

দণ্ড দিব, বিনা দোষে
ত্যজিলে কলত্রে।
ধিককৃত হইবে পুনঃ
হেথায়, পরত্রে।

অতএব এরূপ কার্য্যে আমাকে প্রবৃত্ত করতে বিরত হয়ে, যা ন্যায় তারই প্রতি অভিনিবেশ প্রদান করুন।

অভিপারগ বল্‌লেন—

সুখের বিলোপ মম, জন অপবাদ, আর ধর্ম্মের অত্যয়,
তব সখ্য-সুখ-পাওয়া হৃদয়ে হবে না বোধ এই সমুদয়।
মহীতে মহেন্দ্র তুমি, দানের আহবে কোথা হেন হুতবহ?—
পুণ্যহেতু মোর, যথা ঋত্বিকে দক্ষিণা লয়, তারে তুমি লহ।

রাজা বল্‌লেন—অবশ্য আমার উপর অতি স্নেহবশতঃই আপনি নিজের হিতাহিত উপেক্ষা করে আমার স্বার্থ পরিচর্য্যায় উদ্যত হয়েছেন। বিশেষ করে এই জন্যেই আমি আপনার স্বার্থ উপেক্ষা করতে অক্ষম। তারপর, জনাপবাদের বিষয়েও নিঃশঙ্ক হওয়া যায় না। কেন যায় না, তা বল্‌ছি—

লোক-অপবাদে যারা আদর না করে,
নাহি ভাবে পরকাল, ধর্ম্ম উপেখিয়া,
বিশ্বাস থাকে না কারো তাহাদের 'পরে
অচিরে লক্ষ্মীও যান তাদের ত্যেজিয়া।

অতএব আপনাকে বলি—

ধরমের অতিক্রমে দোষ যাহা—সেত সুনিশ্চিত,
যেবা অভ্যুদয় তাহে, সে কেবলি সন্দেহজড়িত।
জীবনেরও লাগি যদি ধর্ম্মত্যাগে হয় প্রয়োজন,
তবুও তাহাতে যেন রুচি তব না হয় কখন।

কি আর বল্‌ব—

নিন্দা আদি দুখ মাঝে অপরেরে ফেলিয়া,
নিজ সুখে রত নাহি রহে সাধুজন,
পরে নাহি নিপীড়িয়া, ন্যায়পথে চলিয়া,
বেদনা আমার একা করিব বহন।

অভিপারগ বল্‌লেন—"প্রভুর উদ্দেশ্যে ভক্তিপরায়ণ হয়ে আমি যে কাজ করছি, তাতে করে আমার পক্ষে, আর দেব, দীয়মানাকে প্রতিগ্রহণ করে আপনার পক্ষে অধর্ম্ম সঞ্চারের অবকাশ আমি ত কিছুই দেখছিনে—পরন্তু শিবিগণ, সামন্ত ও জানপদগণ সবাই 'এতে অধর্ম্ম কোথায়' এই কথাই বলবে। অতএব দেব, তাকে গ্রহণ করুন।

রাজা বল্‌লেন—"দেখুন, আমার স্বার্থচর্য্যায় আপনি অতিমাত্র আসক্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে বেশ ভাল করে একটু চিন্তা করে দেখুন। আর সামন্তগণ, জানপদবর্গ, শিবিগণ এবং আপনি আমি,—এদের মধ্যে ধর্ম্মবিত্তম কে?

অভিপারগ অমনি সসম্ভ্রমে রাজাকে বল্‌লেন—

শ্রুতিতে তোমার প্রভু অতি অধিকার,
বুধজনে সেবি (তব জ্ঞান যে অপার)।
অতি পাঠকারী তুমি করি বহু শ্রম,
ত্রিবর্গ বিদ্যার তত্ত্বে বৃহস্পতি সম।

রাজা বল্লেন—তাই যদি হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে আপনি আর আমাকে প্রতারিত করবেন না। কেন না—

নরের (স্বভাব) আর হিতাহিত যত,
হয়ে থাকে নৃপতির চরিতানুগত।
কীর্ত্তিমান যেই রাজা, প্রজা তারে পূজে,—
ন্যায়পথে রব আমি এই সব বুঝে।

সুপথ কুপথ কিছু না ভাবিয়া মনে
গাভী যথা বৃষভের অনুগামী হয়।
নৃপে অনুসরি তথা চলে প্রজাগণে
শুভ কি অশুভ কারো মনে নাহি লয়।

তারপর আপনি আরো দেখুন—

নিজেরে শাসনে রাখি—সে শকতি নাহি যদি হয়,
মোর হাতে মানুষের কি ঘটিবে কহন না যায়।

অতএব হয়ে চির প্রকৃতির হিতমোক্ষমান,
নিজেরও লাগিয়া চাহি ধর্ম্ম আর যশ সুবিমল,
প্রজার নেতা যে আমি, গাভীদলে বৃষভপ্রধান,
আমি কি লভিতে পারি বাসনার বশের কবল ?

রাজার এই অবস্থা দর্শনে প্রসাদিতমন অভিপারগ অমনি রাজাকে প্রণাম করলেন, আর কৃতাঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন—

কি ভাগ্যসম্পদ্‌শালী এ রাজ্যের প্রকৃতিনিকর,
পালনে নিরত তুমি যাহাদের, হে নরদেবতা !
বিসর্জ্জিয়া সুখসাধ, ধর্ম্ম-অনুগমনে তৎপর—
বনবাসী তাপসেও তোমা হেন সাধু মিলে কোথা !

'মহৎ' শব্দটি এই আজি মহারাজ,
তোমাতেই অর্থসহ করিছে বিরাজ।
অগুণীর যদি কেহ গুণগান করে
রূঢ় অতি ঠেকে তাহা আখরে আখরে।

মহৎ তোমার এই আচরণে আছে বল বিস্ময় কি আর,
সমুদ্র যেমন নানা রতনের, তুমি তথা গুণের আধার।

তাহলেই দেখা গেল তীব্রদুঃখে অভিভূত হয়েও সাধুজন আপন অটুট ধৈর্য্য আর সুঅভ্যস্ত ধর্ম্মের বলে নীচ মার্গের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ হয়ে থাকেন। অতএব ধৈর্য্য-ধর্ম্মের অভ্যাসের জন্য যোগসাধন কর্ত্তব্য। ইতি—

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

মহাদেব।

——:*:——

ভগীরথ-স্তুতিবাদে সুরধুনী যবে
বাহিরি' বৈকুণ্ঠ হ'তে বিশাল গর্জ্জনে
চলিল মহীর পানে—কাননে কাননে
মূর্চ্ছা গেল বিহঙ্গম পলকে নীরবে
শুনি' সে গর্জ্জন ; বনে বনে ফুকারিয়া
মৃগেন্দ্র শার্দ্দূল যত মার্জ্জারের মত
লুকাইল—হিমাদ্রির শৃঙ্গ শত শত
তুচ্ছ বালিরাশি যেন পড়িল খসিয়া।
হু হু হু হু শব্দে ছুটি' আসে বেগবতী,
মাতা বসুন্ধরা শুনি' কাঁপে থর থর—
মহী বুঝি ধ্বংশ হয়—কাহার শকতি
ধরিবে সে ভীমস্রোতে ?—তুমি গঙ্গাধর !
আপনার শির পাতি' সে কলুষ-হরা
ধরিয়া রক্ষিলে এই দীন বসুন্ধরা।

(২)

তোমারে ডাকে নি কেহ, সুরাসুরে যবে
দোঁহে মিলি আরম্ভিল সাগরমন্থন,
তোমারে ভুলিয়া কেহ চাহে নি, গরবে
যবে তারা করি' নিল অমৃত বণ্টন।
অবশেষে উঠি' এল তীব্র হলাহল !—
দেব যক্ষ রক্ষ নর কিন্নরের প্রাণ
গেল কাঁপি' মহাত্রাশে ; পৃথ্বী কম্পমান,
স্বর্গ মর্ত্ত্য বুঝি আজি যায় রসাতল !
কোথা যাবে কি করিবে নাহি জানে কেহ—
দেব যক্ষ রক্ষ সবে শঙ্কিত বিহ্বল !
তুমি আসি' অবহেলে রক্ষিলে সকল,
পান করি কালকূটে ; ত্রিদিবে অজেয়,
দেব মাঝে মহাদেব নীলকণ্ঠ তুমি,
অপ্রমেয়, অরিন্দম, জ্ঞানশক্তি-ভূমি !

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নবীনের প্রতি।

হে নবীন, হে তরুণ! পশ্চিম-অচলে
যেথা ধীরে ডুবিতেছে অস্তগামী রবি,
আঁখি সেথা বদ্ধ করি' বিষণ্ণ বিরলে
নাহি ফেল অশ্রুজল; নবারুণ-ছবি
উদয় অচলে যেথা বিশ্ব-মহাকবি
আঁকিয়া দিতেছে চির পুলক-হিল্লোলে
সেথা খোঁজ সত্য তব; প্রাণের কল্লোলে
যেথা যত উঠিতেছে লয় তান, সবি
বিশ্বকবি-গীত গান; মোরা তারি সুরে
পুষ্পসম ফুটি' উঠি' পলকে পুলকে
সোহাগে সুবাস টানি' দিগন্ত-আলোকে,
মূরছিয়া পড়ি পুনঃ অন্তরীক্ষ-পুরে;—
পশ্চিম-অচলে শ্রান্ত ঢলি' পড়ি' সুখে
আবার উদয়াচলে জাগি' হাসিমুখে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।